Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 475 – 483
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন : প্রেক্ষাপট পার্বত্য চট্টগ্রাম

মো. আজিম উদ্দিন
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : ornobdu71@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Kok Borok, Rinai Risa, Abiyak Sonami, Khram, Khainak, Achai, Katharak Puja, Boishu, Pachon, Machang.

Abstract
This paper concerns about the cultural life of Tripura community of Chittagong Hill Tracts (CHT) of Bangladesh. The CHT consists of three hill districts named Rangamati, Khagrachari and Bandarban. It is also the home of 11(eleven) indigenous groups. They are Chakma, Marma, Tripura (Tipra), Tanchangya, Mru or Murung, Khumi, Bawm or Bonjogi, Pangkhoa, Lushai, Chak and Khyang. Among them the Tripuras are considered as the third largest indigenous group in the vast mountainous region. They all belong to the Mongoloid ethnic group. Each indigenous group of CHT has its own separate dialect, food habits, dress, religious beliefs, rituals, festivals, history, heritage, diverse culture and above all traditional way of life. Tripura community live in the three hill districts of Rangamati, Khagrachari and Bandarban. But most of the Tripuras originally live in Khagrachari hill district. Furthermore, nearly half a million Tripura have been living separately in Chittagong, Noakhali, Chandpur, Comilla, Moulavibazar, Sylhet, Faridpur and Dhaka districts since time immemorial. The community is divided into 36 clans, popularly known as 'Dofa'. Out of these 36 clans, a total of 16 sub-groups are currently living in Bangladesh. Among the Tripuras diversity is observed in terms of behavior, dress, customs, speech and use of ornaments. The family structure of the Tripura community is patriarchal. Their language is popularly known as 'Kok Borok'. Their main festival is called 'Boishu'. Most of the Tripuras are followers of Hinduism and a significant portion of them follow Christianity. Their cultural life is really very impressive. The natural features of Tripura community will easily charm any person. The Tripura community is humble, peace-loving, hospitable, helpful, liberal, friendly and hard working. In CHT, the Tripura community have been living peacefully with the neighboring indigenous communities and the Bengalis for many ages.

They believe in peace and harmony. This article will explore the cultural life of Tripura community of Chittagong Hill Tracts (CHT).

Discussion

ভূমিকা : প্রত্যেক সমাজে মূল ধারার জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও বাস করে। যারা আদিবাসী, আদিম, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, উপজাতি, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, অনুন্নত জাতি, অনুন্নত জনগোষ্ঠী এবং জনজাতি গোষ্ঠী প্রভৃতি নামে সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশে পার্বত্য এলাকার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বাস করে। ২০১১ সালে পরিচালিত আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা প্রায় ১৫,৮৬,১৪১ জন। পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী তাদের মধ্যে অন্যতম। 'ত্রিপুরা' শব্দটি একই সাথে দুটি অর্থের নির্দেশ করে। একটি দেশ বাচক অন্যটি জাতি বাচক।[১] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী ৩৬টি দফায় বিভক্ত। পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত ত্রিপুরারা মূলত রিয়াং দফার অন্তর্ভুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তর-পূর্বে ভারতীয় রাজ্য মিজোরাম, দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার বা বার্মার আরাকান প্রদেশ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মূল অংশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী। বাংলাদেশ ও ভারতের বাইরে মিয়ানমারে কিছুসংখ্যক ত্রিপুরা বাস করে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিনন্দন বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি বাংলাদেশের বৃহত্তর সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের স্বরূপ অনুসন্ধানই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি : এই গবেষণাকর্মে বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Narrative Method) অনুসৃত হয়েছে। গবেষণাটি মূলত দ্বৈতীয়িক (Secondary) উৎস নির্ভর। দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্হ, গবেষণা পত্রিকা, প্রতিবেদন, দৈনিক সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও অনলাইন ওয়েবসাইট প্রভৃতি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম : পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ আমল থেকে ভৌগোলিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। ১৮৬০ সালের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার অংশ ছিল বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন বাংলার হরিকেল[২] জনপদের অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এ নামগুলো হলো- 'চট্টল' বা 'চট্টগ্রাম', 'কোহ-ই-চাটগ্রাম', 'জুম এ নোয়াবাদ', 'জুম বঙ্গ' ও 'কাপাস মহল' প্রভৃতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ৫, ০৯৩ বর্গমাইল বা ১৩,১৮৯ বর্গ কিলোমিটার। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর ও উত্তর পূর্বে রয়েছে যথাক্রমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং মিজোরাম (লুসাই হিলস), দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে মায়ানমার (বার্মা) এর আরাকান অঞ্চল (রাখাইন প্রদেশ)। এর পশ্চিমে ও দক্ষিণে রয়েছে যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা।[৩] পার্বত্য চট্টগ্রামে ছোট বড় মোট ৭টি নদী রয়েছে। এগুলো হল- ফেনী, চেঙ্গী, মায়ানি, কাসালং। কর্ণফুলী, সাংগু ও মাতামুহুরী। ১৬৬৬ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে (১৬৫৮-১৭০৭) পার্বত্য চট্টগ্রাম মোগল অধিকারে আসে। ১৭৬০ সালে বাংলার নবাব মীর কাশিম পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পুরো চট্টগ্রামের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দেন।[৪] ১৮৬০ সালে রেইড অব ফন্টিয়ার ট্রাইবস এ্যাকট ২২ অব ১৮৬০ সাল এবং এ্যাকট xxii অব ১৮৬০ সাল অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে একটি পৃথক জেলা গঠিত হয়।[৫] ১৯০০ সালের ১মে বৃটিশ সরকার বহুলালোচিত Chittagong Hill Tracts Regulation 1900 জারি করে।[৬] এ আইন সম্পর্কে সুনীতি ভূষণ কানুনগো-র মন্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> "By regulation of 1900 the Hill Tracts were constituted a district and placed in charge of a Superintendent. The regulation came into force with effect from the first of May 1900..."[৭]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরবর্তী সময়ে ১৯৮৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৯নং, ২০নং ও ২১নং আইন তিনটিতে যথাক্রমে রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন

(বর্তমানে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন), বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (বর্তমানে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন) এবং খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন (বর্তমানে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন) চালু করা হয়।[৮] ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে বহুল আলোচিত ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চুক্তি'[৯] স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৮ সালের ৬ মে জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ পাশ হওয়ার অব্যবহিত পর 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ'[১০] নামক পাঁচ বছর মেয়াদী একটি স্বতন্ত্র পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীকালে (১৫ জুলাই, ১৯৯৮) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী : পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায়। ত্রিপুরা সমাজ মূলতঃ মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর টিবোটো-বার্মেন শাখার বোড়ো শ্রেণীভুক্ত ভাষাভাষী একটি জনগোষ্ঠী।[১১] ত্রিপুরা নামটি প্রথম পাওয়া যায় ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের মুদ্রায়।[১২] ত্রিপুরাদেরকে চাকমারা 'তিবিরা', মারমারা 'ম্রো', লুসেইরা 'তুইকুক' এবং পাঙ্খোয়ারা 'বাই' নামে অভিহিত করে থাকলেও তারা নিজেদেরকে 'তিপারা' বা 'তিপ্রা' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। 'ত্রিপুরা' নামের উৎপত্তি বিষয়ে সবচেয়ে প্রচারিত মতবাদটি হলো 'তৈ' ও 'প্রা' শব্দ সমষ্টির সমন্বয়।[১৩] ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিক, নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। R. M. Nath তাঁর *The Background of Assamese Culture* গ্রন্থে ত্রিপুরা শব্দটি 'তিফ্রা' শব্দ থেকে এসেছে মর্মে উল্লেখ করেন।[১৪] ত্রিপুরাদের শারীরিক গঠন মাঝারি আকৃতির। *Indigenous People of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh* গ্রন্থে ত্রিপুরাদের মূল আবাসভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে –

> "The 'Tripura' of India was the original land of the 'Tripura' tribe. From that place they moved to the Chittagong Hill Tracts region; and there is a written glorious history on the reign of Maharaja of 'Tripura".[১৫]

ভারতীয় উপমহাদেশে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর রয়েছে এক বর্ণাঢ্য ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরাদের সম্ভাব্য জনসংখ্যা ১,৩৩,৭৯৮ জন।[১৬] তবে সর্বাধিক সংখ্যক ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়। উক্ত জেলায় ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো নিচে উপস্থাপিত হল –

ভাষা : ভাষার মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। বর্ণমালা না থাকলেও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর একটি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবাহী ভাষা রয়েছে, যার নাম 'ককবরক'[১৭]। ত্রিপুরা ভাষা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর টিবেটো-বর্মন পরিবারভুক্ত আসাম-বার্মিজ শাখার বোড়ো ও কুকী-চীন ভাষাগুলোর মধ্যে বোড়ো দলভুক্ত একটি ভাষা।[১৮] এক সময় ত্রিপুরা রাজ্যের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভকারী ককবরক ভাষাকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করে।[১৯] বাংলাদেশে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা না থাকার কারণে মাতৃভাষায় পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। আশার কথা হলো-সীমিত পরিসরে হলেও ত্রিপুরারা রোমান হরফে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পেরেছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ : ত্রিপুরাদের পোশাক-পরিচ্ছদে রয়েছে বৈচিত্র্য। নারী-পুরুষের পোশাকে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরাদের বিভিন্ন 'দফা' বা দলের মধ্যে মহিলাদের পরিধানের জন্য নানা রঙ ও ডিজাইনের পোশাক দেখতে পাওয়া যায়।[২০] ত্রিপুরা নারীদের দেহের নিম্নাংশে পরিধানকৃত বস্ত্র রিনাই এবং ঊর্ধ্বাংশে পরিধানকৃত বস্ত্র রিসা নামে পরিচিত। পুরুষদের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের মধ্যে রয়েছে-নিম্নাঙ্গে ব্যবহারের জন্য রিমতই, তেনা, উত্তমাঙ্গে ব্যবহারের জন্য গুবাই বরক, বিকি, মাথায় পাগড়ি বাঁধার জন্য খ্রোকরিসা, পথে প্রবাসে জিনিস-পত্র বহনের জন্য মাসা, খিরসা ইত্যাদি।[২১] তবে জুমে কাজ করার সময় ত্রিপুরা নারী-পুরুষরা বিশেষ পোশাক পরিধান করে।

খাদ্যাভ্যাস : ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকেরা রান্নার ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসরণ করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ন্যায় ত্রিপুরারাও বাঁশের চোঙায় রান্না করে থাকে। মৌকজাক, হাংজাক ও প্রেংজাক ত্রিপুরাদের বিশেষ খাদ্য।[২২] জুমে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের মসলা রান্নায় স্বাদবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পার্বত্যাঞ্চলের ত্রিপুরারা সাধারণত

নিকটবর্তী বন-জঙ্গল থেকে শাক-সবজি সংগ্রহ করে থাকে। অভাবের দিনে অন্ন সংস্থানের জন্য অনেকেই দূরবর্তী অঞ্চলে গিয়ে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ত্রিপুরারা বাজার থেকে মাছ-মাংস, শাক-সবজি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে থাকে।

পারিবারিক কাঠামো : বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমাজে সাধারণত দুই ধরনের পারিবারিক কাঠামো দেখা যায়। যেমন - ১. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও ২. মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ত্রিপুরাদের পারিবারিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। পরিবারে পিতার অবর্তমানে প্রথমে মাতা এবং মাতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে একমাত্র ত্রিপুরা সমাজেই নাইতং সহ বেশ কয়েকটি গোত্রে দ্বিধারায় বংশগণনা করার রীতি প্রচলিত আছে।[২৩] সুশৃঙ্খল পারিবারিক কাঠামো তাই ত্রিপুরা সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান : পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা সমাজে জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। ত্রিপুরা সমাজে নবজাতকের নাভীরজু শুকিয়ে গেলে 'আবিয়াক সুমানি' নামক শুদ্ধিকরণ পূজার মাধ্যমে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।[২৪] নবজাতকের নামকরণের ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা সম্প্রদায় বিশেষ রীতি অনুসরণ করে থাকে। ত্রিপুরা সমাজে কেউ মারা গেলে মৃত্যুর পরপরই মৃত ব্যক্তির বাড়িতে 'খ্রাম' বা ঢোল বাজাতে হয় ও কীর্তন করতে হয় মৃত্যুর সংবাদ গ্রামের আশেপাশের মানুষকে জানানোর জন্য।[২৫] ত্রিপুরা সমাজে মৃতদেহকে সাধারণত চিতায় দাহ করা হয়। মৃতদেহ শবাধারে করে চিতায় নিয়ে যাওয়া হয়। শবাধার চাকমা ভাষায় 'আলং' মারমা ভাষায় 'সিখাইক'/'ছংবাই' নামে পরিচিত হলেও ত্রিপুরা ভাষায় এটি 'খাইনক' নামে বিশেষভাবে পরিচিত। পুরুষের মৃতদেহের জন্য পাঁচস্তর এবং নারীর মৃতদেহের জন্য সাতস্তর বিশিষ্ট লাকড়ি দিয়ে চিতা প্রস্তুত করা হয়। চিতার ছাইভস্ম ও অস্থি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সামর্থ্যানুয়ী ত্রিপুরা সমাজে শবদাহের **১৩** দিন পর মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়।

বিবাহ : পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমাজে বিবাহ প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে মদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। অপরাপর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমাজের ন্যায় ত্রিপুরা সমাজেও কিছু সুনির্দিষ্ট পূজানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ত্রিপুরা সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন 'অচাই'।[২৬] বিবাহের মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় মূলত বরের নিজ বাড়িতে। সাধারণত পাত্রপক্ষের প্রস্তাব, পাত্রী পক্ষের সম্মতি, কাথারক পূজা[২৭] ও কাইজালাইমুং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা অনুসারে সামাজিক বা নিয়মিত বিয়ে সম্পন্ন হয়।[২৮] ত্রিপুরা সমাজে আন্তঃগোত্রীয় বিবাহ প্রচলিত। সমাজে কনেপণ প্রথার প্রচলন রয়েছে। আর এই কনেপণ সমাজে 'দাফা' নামে পরিচিত।

ধর্ম বিশ্বাস : ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা ও মারমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হলেও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী হিন্দু ধর্মের অনুসারী। ত্রিপুরাদের নিজস্ব দেবতার মধ্যে মাতাই কতর, লাম, প্রা, সংগ্রংমা, তুইমা, মাইলুংমা, খুঁইজংমা, বুড়াসা, বানিরাও, সাতবোন বুড়িরক, কারায়া ও গরায়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৯] রোগব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ, দেবতার সন্তুষ্টি অর্জন, জুমে প্রত্যাশিত পরিমাণ ফলন লাভ, সন্তান জন্মের পর এবং বিবাহ উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী এসব দেবতার নামে পূজা করে থাকে। 'অচাই' নামক সর্বজনমান্য ব্যক্তির পৌরহিত্যে সমস্ত পূজানুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এ প্রসঙ্গে *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh the Untold Story* গ্রন্থের একটি মন্তব্য বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য –

> "The Tipras are Hindus by religion. But their way of life is different in many ways from that of the caste Hindus. These Difference are marked in their Puja and other socio-religious festivals".[৩০]

উদ্ধৃত অংশ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী হিন্দু ধর্মের অনুসারী হলেও পূজা এবং অন্যান্য ধর্মীয়-সামাজিক উৎসবের ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র।

উৎসব : পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলো ভিন্ন ভিন্ন নামে বাংলা চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষ উৎসব উদযাপন করে থাকে। চাকমা ভাষায় এ উৎসব 'বিজু', মারমা ভাষায় 'সাংগ্রাইং' এবং ত্রিপুরা ভাষায় 'বৈসু' নামে পরিচিত। বৈসু শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে *ত্রিপুরা জাতির মাণিক্য উপাখ্যান'* গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "সংস্কৃত বিষু থেকে ত্রিপুরা ভাষায় (কক-বরক) বৈসু শব্দের উদ্ভব।[৩১] এ উৎসবের ব্যাপ্তিকাল তিন দিন। 'বৈসু'-র প্রথম দিনকে বলা হয় 'হারি বৈসু', দ্বিতীয় দিনকে 'বৈসুমা' এবং তৃতীয় বা শেষ দিনকে বলা হয় 'বিসিকাতাল'।[৩২] পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরারা বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ, ফুলের মালা তৈরি, বাহারি স্বাদের পিঠা তৈরি এবং পাঁচন রান্নাসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বৈসু উৎসব উদযাপন করে থাকে। এ উৎসবের সময় বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। পরিশেষে সকলের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে পূজা করা হয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এমনকি প্রতিবেশী বাঙালিরাও এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

বাসগৃহ : মাচাংঘরে বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। পার্বত্যাঞ্চলের গহীন অরণ্যাবৃত পাহাড়ের উপর মাচাং তৈরি করে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী বসবাস করে। পার্বত্য এলাকা স্বাপদ-সংকুল হওয়ায় ভূমি থেকে পর্যাপ্ত উচ্চতা রেখে মাচাং তৈরি করা হয়। মাচাংঘরে উঠার জন্য গাছের তৈরি সিঁড়ি ব্যবহৃত হয়। এই মাচাংকে ত্রিপুরারা গোত্র বা দফাভেদে কেউ নুগু বলে, কেউ নুয়ুং বলে, আবার কেউ কেউ চাকেরেং বলে।[৩৩] উল্লেখ্য, প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে মাচাংঘরের অভ্যন্তর ভাগ সাজিয়ে থাকে। আর এই বাসগৃহ তৈরির যাবতীয় উপকরণ যেমন- বাঁশ, গাছ, শন, ও বেত প্রভৃতি নিকটবর্তী বন-জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা হয়।

অলংকার : ত্রিপুরা রমণীদের অলংকার ব্যবহারের বিষয়ে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আর তা হলো ত্রিপুরা রমণীরা কুকিদের ভয়ংকর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য গলায় বিভিন্ন ধরনের অলংকার ব্যবহার করত।[৩৪] ত্রিপুরা রমণীদের অলংকার ব্যবহারে রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা বিভিন্ন নকশার অলংকার ব্যবহার করে থাকে। ত্রিপুরা রমণীরা চুলের খোঁপায় সাংগে, গলায় আঁচিলি, লক, চন্দ্রহার ও রামতাঙ, কানে তয়া ও ওয়াখুম, পায়ে বেঙকি, নাকে নাফু ও বরকলি এবং হাতের আঙুলে য়েইতাঁ ব্যবহার করে।[৩৫] উল্লেখ্য, আধুনিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের ফলে বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ও উন্নত অলংকার সহজলভ্য হয়েছে। সামর্থবান ত্রিপুরা রমণীরা এসব উন্নত নকশার অলংকার ব্যবহারে অভ্যস্ত হচ্ছে। ত্রিপুরা পুরুষরা একসময় অলংকার ব্যবহারে আগ্রহ দেখালেও বর্তমানে তা আর দেখা যায় না।

লোকসাহিত্য : লোকসাহিত্য বলতে বুঝায় যে সব গল্প, ছড়া, কবিতা, ধাঁধা, উপ-কথা, উপাখ্যান লোক মুখে মুখে বহুদিন ধরে আসছে।[৩৬] যেকোনো জনগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য তাদের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কয়েকটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব লোকসাহিত্য আছে ত্রিপুরারা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরাদের লোক গীতিকাব্যের মধ্যে 'পুন্দা তান্নায়', 'লাংগই রাজানো বুমানি', 'হায়া হা সিকাম কামানি', 'খুম কামানি', 'গাঁ তলিয়ো থাঁমানি' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।[৩৭] ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকসাহিত্যে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতি ফুটে উঠে। এসব লোকসাহিত্যে যথেষ্ট সাহিত্যরসের উপস্থিতি রয়েছে। এসব লোকসাহিত্য ত্রিপুরা সমাজের দর্পণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

নৃত্য-গীত : পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের নৃত্য-গীত তাদের জীবন-জীবিকা, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। নৃত্যের প্রতি ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর রয়েছে প্রচণ্ড অনুরাগ। এ প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাবেক ডেপুটি কমিশনার Capt. T. H. Lewin একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক –

> "The Tipperahs are passionately fond of dancing, and at the time of their great harvest festival, which takes place generally in November, the dances are kept up sometimes for two days and two nights without intermission."[৩৮]

ত্রিপুরাদের ঐতিহ্যবাহী নাচগুলির মধ্যে গরয়া নৃত্য, কাথারক নৃত্য, বোতল নৃত্য, হাজাগিরি নৃত্য অন্যতম।[৩৯] ত্রিপুরারা সংগীতপ্রেমী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরাদের সংগীত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে-

> "মধ্য রাত্রে সকরুণ বাঁশির সুর শুনিয়া এখানকার (উদয়পুর) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সুর কোথা হইতে আসিতেছে? উত্তরে বলিলেন, বন্য বরাহ হইতে জুম ক্ষেত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃষক বাঁশি বাজাইয়া ক্ষেত্র পাহারা দিতেছে। ক্ষেত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত যাহাদের বাঁশির সুরে এ বৈচিত্র্যময় শৈল বিন্যাস, উপরের শিখরে ইহার স্থান অবশ্যাম্ভাবী"[৪০]

পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সংগীতের প্রতি যে গভীর অনুরাগ তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

উপসংহার : পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠার বিচারে তৃতীয় ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী চাকমা ও মারমাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। চাকমা ও মারমা ভাষায় নিজস্ব বর্ণমালা থাকায় অন্তত প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় পাঠদান সম্ভব। কিন্তু ত্রিপুরাদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা না থাকায় মাতৃভাষায় পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। ত্রিপুরা নারীরা কঠোর পরিশ্রমী। তারা আত্ম-মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পছন্দ করে। জুমে পরিশ্রম করার পাশাপাশি তারা বেইন বা কোমর তাঁতে বস্ত্র বয়ন করে। পুরুষের পাশাপাশি ত্রিপুরা নারীরাও পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ত্রিপুরাদের খাদ্যাভ্যাসে রয়েছে ভিন্নতা। ত্রিপুরা সমাজে কেউ জন্মগ্রহণ করলে সুনির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ধাত্রীকে সম্মান জানানো হয়। এছাড়াও কেউ পরলোক গমন করলে ১৩ দিন পর শ্রাদ্ধক্রিয়ার আয়োজন করে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ত্রিপুরা সমাজে আন্তঃগোত্রীয় বিবাহ প্রচলিত। ত্রিপুরারা দীর্ঘকাল ধরে সনাতন (হিন্দু) ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের একটি অংশ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী যথাযোগ্য মর্যাদা ও আড়ম্বরের সাথে বৈসু উৎসব উদযাপন করে। তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে মাচাং তৈরি করে বসবাস করে। ত্রিপুরা রমণীরা ঐতিহ্যবাহী অলংকার ব্যবহার করে। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর রয়েছে সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য ও নৃত্য-গীত। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক জীবন আমাদের আকৃষ্ট করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

Reference :

১. ত্রিপুরা, প্রভাংশু, *ত্রিপুরা জাতির মাণিক্য উপাখ্যান,* জোহেরা এন্টারপ্রাইজ, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃ. ১৩

২. হরিকেল ছিল বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম। ঐতিহাসিকগণ এই অঞ্চলেই হরিকেল জনপদের আদি অবস্থিতির কথা বলেছেন। পরবর্তীতে হরিকেল রাজাদের শাসনকালে সমতট অঞ্চল পর্যন্ত হরিকেল জনপদের সীমা প্রসারিত হয় এবং চন্দ্রবংশীয়দের হাতে এর আরও সম্প্রসারণ লক্ষ করা যায়। সূত্র : ইসলাম, এস. এম. রফিকুল। *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস সেনযুগ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৬

৩. চাকমা, সুগত, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি,* উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ২০০৯, পৃ. ১১

৪. আসাদ, আসাদুজ্জামান, *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন বৈচিত্র ও ইতিহাস,* কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৯

৫. ত্রিপুরা, সুরেন্দ্র লাল, *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি,* ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ২০১২, পৃ. ৭

৬. আসাদ, আসাদুজ্জমান, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১০

৭. Qanungo, Suniti bhushan. *A History of Chittagong Hill Tracts.* Khudra Nreegosthir Sanskritik Institute, Khagrachari, 2013. p. 75

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 475-483
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. চাকমা, সুগত, ভূমিকা,*বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, আদিবাসী জনগোষ্ঠী,* কামাল, মেসবাহ, ইসলাম, জাহিদুল ও চাকমা, সুগত (সম্পাদিত), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৪

৯. শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সময় (১৯৯৬-২০০১) ৭ দফা বৈঠকের পর ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি। সরকারের পক্ষে নেতৃত্ব দেন জাতীয় সংসদের তৎকালীন চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এম. পি এবং জনসংহতি সমিতি/শান্তি বাহিনীর পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা।

সূত্র : রশিদ, হারুন-অর, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৯৬

১০. আঞ্চলিক পরিষদের অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মধ্যেকার ঐক্য ও সংহতিকে বজায় রাখা এবং এই ঐক্য ও সংহতিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বীকৃতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া।

সূত্র : চাকমা, মঙ্গল কুমার, *বিবর্ণ পাহাড় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও সমাধান,* বটেশ্বর বর্ণন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৫২

১১. চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ, রায়, প্রতিম ও চাকমা, সুগত (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), *পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন,* স্বস্তি প্রিন্টার্স, ঢাকা, ২০১২, স্বত্ব-মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, পৃ. ৯৯

১২. চাকমা, সুগত, *ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা,* ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, ২০১১, পৃ. ৮৩

১৩. ত্রিপুরা, মথুরা বিকাশ,*ত্রিপুরা সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবিকা,* ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি, ২০১৯, পৃ. ১১

১৪. *ঐ*, পৃ. ১২

১৫. Rahman, M. Atiq-Ur, Taher, M. A. *Indigenous People of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.* Oitijjhya, Dhaka, 2004. p. 101

১৬. চৌধুরী, মংসানু ও জেন, উ ক্য, *মারমা ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* মারমা উন্নয়ন সংসদ, খাগড়াছড়ি, ২০১৮, পৃ. ৭

১৭. কক অর্থ ভাষা এবং বরক অর্থ মানুষ অর্থাৎ মানুষের ভাষা। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে ককবরক এর অর্থ হলো ত্রিপুরা ভাষা বা ত্রিপুরাদের ভাষা।

সূত্র : ত্রিপুরা, শক্তিপদ ও ত্রিপুরা, সন্তোষ বিকাশ, ত্রিপুরা, *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা,* প্রথম খণ্ড, চাকমা, মঙ্গল কুমার ও অন্যান্য (গবেষণা ও সম্পাদনা), উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, পৃ. ৩২৫

১৮. মফিজ, দেলওয়ার, "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও পার্বত্য উপজাতীয়দের মাতৃভাষা চর্চা", *পার্বত্য উপজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি ভাষা বিষয়ক সেমিনার সংকলন : ১৯৯৯-২০০১,* প্রু.এস.এ (সম্পাদিত)। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান, ২০০২, পৃ. ১৬

১৯. বিস্তারিত জানতে দেখুন- ত্রিপুরা, প্রভাংশু। ত্রিপুরা ও খিয়াং ভাষা-সাহিত্য। *পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য*। চাকমা, শুভ্র জ্যোতি (সম্পাদিত)। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ২০১১, পৃ. ১০১-১১৯

২০. চাকমা, সুগত, *প্রাগুক্ত,* ২০০৯, পৃ. ৯৭

২১. ত্রিপুরা, প্রভাংশু, ত্রিপুরা, কামাল, মেসবাহ, ইসলাম, জাহিদুল ও চাকমা, সুগত (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১৭

২২. ত্রিপুরা, শক্তিপদ ও ত্রিপুরা, সন্তোষ বিকাশ। ত্রিপুরা। চাকমা, মঙ্গল কুমার ও অন্যান্য (গবেষণা ও সম্পাদনা)। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৩২

২৩. চাকমা, সুগত। *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার* । নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬২

২৪. ত্রিপুরা, মথুরা বিকাশ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯৭

২৫. ত্রিপুরা, অরুনেন্দু, চাকমা, হরি কিশোর ও দেওয়ান, সুমিতা (সম্পাদিত)। *ত্রিপুরা সামাজিক আইন বিষয়ক কর্মশালা ২৫ ও ২৬ মে, ২০০১*। উদ্যোক্তা- টংগ্যা, ত্রিপুরা কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং জাবারাং। চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ডেভেলাপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার, টংগ্যা, রাঙ্গামাটি, ২০০১, পৃ. ৬০

২৬. ত্রিপুরা সমাজে অচাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বিভিন্ন সামাজিক পার্বণে অচাই এর গুরুত্ব রয়েছে। কয়েকটি গ্রামের মধ্যে কমপক্ষে একজন করে অচাই দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামের বিভিন্ন লোকপূজার জন্য একজন অচাই অপরিহার্য। সূত্র: খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা খাগড়াছড়ি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৬০

২৭. কাথারক পূজা অনুষ্ঠিত হয় গৃহের বাইরে ঘরের উঠানে কিংবা স্রোতবাহী জলের উৎসস্থলে। কাথারক পূজার অধিদেবতার নাম 'কার্ত্তিক-গণেশ'। কার্ত্তিক ও গণেশ এই সহোদর দেবদ্বয়কে ত্রিপুরা ভাষায় 'কাথারক' বলে। চুমলাই পূজার মতই এ পূজার উপকরণাদি। তবে বলির রুধির জন্য ১ জোড়া অনুপক্ষী ও একটি বাগবল উৎসর্গ করতে হয়। সূত্র: ত্রিপুরা, প্রভাংশু। ত্রিপুরা উৎসব ও বিবাহ।*পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় উৎসব ও বিবাহ,* চাকমা, সুগত (সম্পাদিত), উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ২০০৭, পৃ. ৫৩

২৮. চাকমা, সুস্মিতা, *প্রথাগত আইনে আদিবাসী পাহাড়ি নারীর অবস্থান,* চাকমা, মঙ্গল কুমার (সম্পাদিত), বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৩

২৯. বিস্তারিত জানতে দেখুন - চাকমা, সুগত, *প্রাগুক্ত,* ২০১২, পৃ. ৬২-৬৩

৩০. Mizanur Rahman Shelley (Edited). *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh the Untold Story.* Centre for Development Research Bangladesh (CDRB), Dhaka, 1992. p. 55

৩১. ত্রিপুরা, প্রভাংশু, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪২

৩২. ত্রিপুরা, শক্তিপদ, সমাজ ও সংস্কৃতিঃ ত্রিপুরা আদিবাসী প্রেক্ষিত, *বাংলাদেশের ত্রিপুরা জনজাতি ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য,* বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃ. ১০০

৩৩. ত্রিপুরা, মথুরা বিকাশ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩৩

৩৪. খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১৪-১১৭

৩৫. ত্রিপুরা, শক্তিপদ ও ত্রিপুরা, সন্তোষ বিকাশ, ত্রিপুরা, চাকমা, মঙ্গল কুমার ও অন্যান্য (গবেষণা ও সম্পাদনা), *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৩১

৩৬. ম্রো, সিংইয়ং। ম্রো ও খুমী ভাষা-সাহিত্য, *পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য,* চাকমা, শুভ্র জ্যোতি (সম্পাদিত), ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ২০১১, পৃ. ১৩১

৩৭. *ঐ,* পৃ. ৩২৬-৩২৭

৩৮. Capt. T. H. Lewin. *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein with comparative vocabularies of the Hill Dialects.* Khudra Nrigoshthir Cultural Institute, Khagrachari, 2011. p. 81

৩৯. কানুনগো, সুনীতি ভূষণ, *পার্বত্য চট্টগ্রাম : ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি,* রেগা প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি, ২০১৮, পৃ. ৫৯

৪০. ত্রিপুরা, প্রভাংশু, ত্রিপুরা, কামাল, মেসবাহ, ইসলাম, জাহিদুল ও চাকমা, সুগত (সম্পাদিত)। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১০